ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No.570-576
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.246

প্রসঙ্গ নৈতিক আদর্শ ও মুল্যবোধ: প্রেক্ষাপট ভারতীয় নীতিদর্শন

পারমিতা রায়, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.01.2026; Accepted: 20.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The article mainly talks about two great Indian philosophies: Buddhism and Jainism. First, it explains Buddhism. Lord Buddha taught the Four Noble Truths. He said that suffering is a part of life, but there is a way to end it. To find peace, people should follow the Eightfold Path. This path includes simple things like speaking the truth, doing good work, and having good thoughts. These rules help people improve themselves and find a balance between old and new ways of living.

Second, the article discusses Jainism. Jainism gives us Five Main Rules (*Pancamahāvrata*). The most important rule is Non-violence (*Ahimsā*). It means we should not hurt any living being with our work, our words, or even our thoughts. It also teaches us to be honest and not to take things that do not belong to us. These rules help people live a disciplined and kind life.

The article shows that true values are timeless. Just like a river that keeps flowing even if its path changes, moral truths remain the same in every age. These ancient Indian lessons serve as a guiding light for the new generation. They teach us how to be more compassionate, how to help others, and how to find real happiness in today's busy world.

Keywords: Ideal values, Moral ideals, Buddhist philosophy, Jain philosophy, good character, non-violence, eternal peace and a disciplined way of life

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এ ভাবনা স্বাভাবিক যে, নীতিহীনতা বা তথাকথিত দুর্নীতিপরায়ণতাই বোধ হয় বর্তমান নীতি। তাই সমকালীন মানুষের মনে প্রশ্ন— আমাদের পুরনো মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা কী সম্ভব? সনাতন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা কী আমাদের টেনে নিয়ে যাবে অবলুপ্তির পথে? যা কিছু এতদিন সত্য বলে মেনেছি, ধ্রুব বলে জেনেছি, কল্যাণ-সুন্দর বলে চিনেছি সে সবই কী বিসর্জন দিতে হবে? প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মতো আমরাও কী লুপ্ত হয়ে যাবো? প্রাচীন ও নবীন জীবন বোধের মধ্যে কোথাও কী সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব? এ বিশ্বে সত্যিই কী আছে শাশ্বত কোনো নৈতিক আদর্শ যা নতুন প্রজন্মের কাছে প্রকাশ করবে? এই প্রশ্নগুলি এবং এরকম অনেক সম্যসার সমাধান করতে হলে ভারতের সনাতন নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে, অবহিত হতে হবে। ভারতের সনাতন নৈতিক আদর্শ মানুষকে কেবল নৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেনা, সেই সঙ্গে নতুন নীতিনিষ্ঠ হওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের জীবনচর্যাকেও অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়। কয়েক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর আজও ভারতীয় নীতিদর্শনের আনুগামীরা জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে ভারতের নৈতিক ধ্যান ধারণা আনুসারে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করে চলেছেন। ভারতীয় নীতিদর্শন মানুষকে শুধু যে সুন্দর চরিত্র লাভের আধিকারী করতে চেয়েছেন তা নয়, তাঁকে

মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মানবজীবনের নৈতিক সাধনা সর্বদাই এক গভীর অনুসন্ধানের ইতিহাস— যেখানে মানুষ নিজের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে চেয়েছে মুক্তি, শুদ্ধি এবং এক চিরস্থায়ী শান্তি। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এই আত্মিক সাধনার সর্বোচ্চ রূপ প্রকাশ পেয়েছে বৌদ্ধ ও জৈন নীতিদর্শনে। উভয় দর্শনের মূল চেতনা এক আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের দিকে ইঙ্গিত করে— যেখানে ধর্ম মানে কোনো দেবতাপূজিত কর্তব্য নয়, বরং নৈতিক বোধের জাগরণ। এই জাগরণই মানুষকে করে তোলে মানবিক, সহানুভূতিশীল এবং মুক্ত। বৌদ্ধ নীতিদর্শনের চারটি আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পঞ্চশীল এবং জৈন নীতিদর্শনে মহাব্রত বা অনুব্রত প্রকৃতপক্ষে মানুষকে চরিত্রবান করার নীতি। বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত দুটি নীতিদর্শনকে অনুসরণ করে নৈতিকতার আলোকে উপরিউক্ত জিজ্ঞাসাগুলির নীতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণই মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

বৌদ্ধ নীতিদর্শনের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস হল আর্যসত্যচতুষ্টয়, অর্থাৎ চারটি মহাসত্য, যা মানবজীবনের দুঃখ ও দুঃখমুক্তির তত্ত্বকে এক নৈতিক ও অস্তিত্ববাদী কাঠামোয় রূপ দিয়েছে। একে এক শাশ্বত নৈতিক আদর্শ বলা যেতে পারে। কারণ, পৃথিবী ধ্বংস হলেও এই নৈতিক আদর্শের কোন হানি ঘটবে না। এই শাশ্বত নৈতিক আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে এক আশীর্বাদস্বরূপ। এই চিরন্তন নৈতিক আদর্শ প্রাচীন ও নবীন জীবনবোধের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আর্যসত্যচতুষ্টয়:

ক্রম	আর্যসত্য	অর্থ
প্রথম আর্যসত্য	দুক্খং অরিয়সচ্চং	দুঃখ সত্য
দ্বিতীয় আর্যসত্য	দুক্খসমুদয়ং	দুঃখ সমুদায় সত্য
তৃতীয় আর্যসত্য	দুক্খনিরোধং	দুঃখ নিরোধ সত্য
চতুর্থ আর্যসত্য	দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা	দুঃখ নিরোধ মার্গ সত্য[১]

প্রথম আর্যসত্য:

গৌতমবুদ্ধের বোধিলব্ধ প্রথম আর্যসত্য হল দুঃখ সত্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল 'সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্'[২]। এখানে দুঃখ কেবল যন্ত্রণার প্রতীক নয়, বরং অস্তিত্বের অস্থিরতার প্রতীক। প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি সম্পর্ক, প্রতিটি বস্তুই যেহেতু ক্ষণিক, তাই তার মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দের বাস অসম্ভব। এই ক্ষণিকতার বোধই বৌদ্ধ নীতির প্রথম পাঠ— যে পাঠ মানুষকে শেখায় সমস্ত সুখ-আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও বিচ্ছেদের অনিবার্যতা। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই এই দুঃখ জীবনের সঙ্গী। শিশুর প্রথম কান্না যেন সেই দুঃখেরই ঘোষণা— "জীবন মানেই অনিত্যতার স্বীকারোক্তি।"

জীবন মানেই প্রবাহ, পরিবর্তন, ক্ষয়—অর্থাৎ অনিত্যতা। যে মুহূর্তে আমরা কোনও আনন্দ বা সুখকে আঁকড়ে ধরতে চাই, সেই মুহূর্তেই দুঃখের বীজ রোপিত হয়। কারণ, যা ক্ষণিক, তাকে স্থায়ী ভাবার মোহ থেকেই জন্ম নেয় অসন্তোষ। এইভাবে দুঃখ শুধু অনুভূতির নয়, বরং জ্ঞানগত এক উপলব্ধির নাম— অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত অস্থিরতার স্বীকৃতি।

গৌতমবুদ্ধের কথায়, "জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ; প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদ দুঃখ, অপ্রিয়ের সংস্পর্শ দুঃখ, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ না হওয়া দুঃখ।"[৩] এই কথার অর্থ, জীবনের প্রতিটি অবস্থাই দুঃখের সম্ভাবনায় পূর্ণ। তবে, গৌতমবুদ্ধ দুঃখকে হতাশার প্রতীক হিসাবে দেখেন নি; বরং জাগরণের দ্বার হিসেবে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন।

দুঃখ সত্য স্বীকার মানেই পরাজয় নয়, বরং আত্মজাগরণের সূচনা। কারণ, যে দুঃখকে দেখে, সে ধন দেখে না, সুখ দেখে না; কিন্তু সে দেখে মুক্তি— যা দুঃখের ওপারে।

দ্বিতীয় আর্যসত্য:

গৌতমবুদ্ধ কেবল দুঃখের ঘোষণা করেই থেমে যাননি; তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন— "কেন এই দুঃখ?"। যেমন এক চিকিৎসক রোগ নিরাময়ের আগে রোগের কারণ নির্ণয় করেন, তেমনি গৌতমবুদ্ধ দুঃখের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তার মূল উৎস সন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলই হল দ্বিতীয় আর্যসত্য— সমুদয় সত্য।[৪]

দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গৌতমবুদ্ধ কারণশৃঙ্খলের কথা বলেছেন। তিনি মোট বারোটি কারণশৃঙ্খলের কথা বলেছেন।[৫] সেই কারণ শৃঙ্খলের চরম ও সর্বপ্রথম কারণ হল অবিদ্যা। এই অবিদ্যা হল সকল দুঃখের মূল কারণ। অবিদ্যা বশতঃ জীব নানা কর্ম করে এবং তার ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করে থাকে। এই মূল কারণ অবিদ্যা নিরসন হলে পরম্পরাক্রমে সকল কারণ বিনষ্ট হয়, ফলে দুঃখও নিরুদ্ধ হয়।

অবিদ্যা থেকে সংস্কারের উৎপত্তি—অজ্ঞতার কারণে মানুষ কর্ম করে, কর্ম থেকে জন্ম নেয় চেতনা, চেতনা থেকে নাম-রূপ, এভাবে চলতে থাকে দুঃখের কারণচক্র। এই কারণচক্রই সংসারের মূল। যদিও অবিদ্যা মূল কারণ, তাসত্ত্বেও গৌতমবুদ্ধ কখনও কখনও তৃষ্ণাকেও দুঃখের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

তৃতীয় আর্যসত্য:

অবিদ্যা নিরসনে পরম্পরাক্রমে যে কারণ বিনষ্ট হয়, তার ফলস্বরূপ দুঃখও নিরুদ্ধ হয়। এর থেকেই এটা স্পষ্ট হয় দুঃখ নিরোধ সম্ভব। এই সত্যের নাম নিরোধসত্য, যার অর্থ— দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি।[৬] এই চূড়ান্ত অবস্থা, যেখানে আর কোনো জন্ম, মৃত্যু, বা দুঃখের পুনরাবির্ভাব নেই, তাকে বলে *নির্বাণ*। এই *নির্বাণ* অবস্থায় মানুষ সমস্ত প্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে উঠে যায়; সেখানে নেই কোনো আকাঙ্ক্ষা, নেই কোনো দ্বন্দ্ব, নেই কোনো 'আমি' ও 'আমার'—আছে কেবল নিস্তরঙ্গ শান্তি ও মুক্তি। তবে, নির্বাণ কোনো স্থান নয়, কোনো বাহ্য জগৎও নয়; এটি এক অবস্থান—এক চিত্তশুদ্ধি, যেখানে মন ও বুদ্ধি সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে পরম প্রশান্তিতে স্থিত হয়। এর থেকেই আমরা শিক্ষা পাই— মুক্তি বাহিরে নয়, অন্তরে নিহিত; অবিদ্যা ও আসক্তির অন্ধকার যতক্ষণ মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ততক্ষণ মুক্তির অভাব থেকেই যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল— মুক্তির এই পরম শান্তির অবস্থায় মানুষ কীভাবে প্রবেশ করবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই চতুর্থ আর্যসত্য—মার্গসত্যের আলোচনাই প্রবেশ করবো।

চতুর্থ আর্যসত্য:

মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হল নির্বাণ। কারণ, নির্বাণ হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই নির্বাণের পথে পৌঁছানোর জন্য জীবের সর্বাঙ্গীণ সাধনা ও প্রস্তুতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সেই পূর্ণ প্রস্তুতির পথ নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে গৌতমবুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এর কথা বলেছেন[৭], যা মার্গসত্য নামে পরিচিত। এই আটটি মার্গ হল– সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।[৮]

দুঃখের নিবৃত্তি যে সম্ভব—এ বোধই যথেষ্ট নয়; কারণ মুক্তি কেবল ধারণা নয়, তা এক অন্তরযাত্রা, এক চেতনার রূপান্তর। মানুষ যতদিন কেবল জানে, ততদিন সে পথের বাইরে; কিন্তু যখন সে চলতে শুরু করে, তখনই সে মুক্তির পথে পা রাখে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ:

সম্যক দৃষ্টি-অবিদ্যা এবং অবিদ্যাপ্রসূত আত্মা ও জগৎ সম্পর্কে মিথ্যাদৃষ্টিই দুঃখের মূল উৎস। সম্যক দৃষ্টির মাধ্যমে এই ভ্রান্ত দৃষ্টির বিনাশই হল নির্বাণ প্রাপ্তির প্রথমিক স্তর। মানুষের দৃষ্টি বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কর্মের প্রতিফলন ঘটে, কারণ ভ্রান্ত দৃষ্টি থেকেই অশুভ কর্মের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধ দর্শনে কর্ম ও জ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক। বৌদ্ধ দর্শনে চারটি আর্যসত্যের যথার্থ জ্ঞানকেই বলা হয় সম্যক দৃষ্টি। দৈনন্দিন জীবনে সম্যক দৃষ্টি আমাদের শেখাই যে সকল বিষয়কে নিরপেক্ষ ভাবে অর্থাৎ কোন পূর্বগ্রহ বা মোহ ছাড়া সত্যকে উপলব্ধি করতে।

সম্যক সংকল্প- সম্যক দৃষ্টি থেকেই সম্যক সংকল্প উদ্ভূত হয়। অহিংসা, বৈরাগ্য ও বিশ্বমানবতা হল সম্যক সংকল্পের মূল ভাব। সম্যক দৃষ্টির আলকে সকলের প্রতি সদ্ভাব পোষণ করা, এছাড়া অন্যের প্রতি বিদ্বেষ না রাখার যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাই হল সম্যক সংকল্প, অন্যথায় নির্বাণের অন্বেষণে সম্যক সঙ্কল্প অর্থহীন হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি দৈনন্দিন জীবনেও সম্যক সংকল্পের প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় এবং তার উদ্দেশ্য যদি অন্যের কল্যান, সহমর্মিতা ও সততার ভাবনা থেকে করা হয় তখন ই তা সম্যক সংকল্পের প্রকাশ পেয়ে থাকে।

সম্যক বাক্-সম্যক সংকল্পকে বাস্তব জীবনে কার্যরূপ দেওয়া জরুরি। বাক্ বিভিন্ন কর্মের একটি প্রধান উপাদান। শুধু মিথ্যা কথা না বলাই বাক্ সংযম নয়, পরনিন্দা, পিশুনবাক্য ও অন্যের প্রতি কঠোর বাক্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকাও বাক্ সংযমের অন্তর্ভুক্ত। সম্যক বাক্ের অনুশীলন ব্যক্তিকে আত্মসংযমী, সহানুভূতিশীল ও নীতিবান করে তলে। এটি কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক বিকাশের উপায় নয় বরং সামাজিক সৌহার্দ্য ও সুষ্ঠ আচরণের প্রকাশ ঘটায়।

সম্যক কর্মান্ত-শুধু বাক্ সংযমেই সম্যক সংকল্পের পূর্ণতা লাভ হয়না। সম্যক সংকল্পের সঙ্গে কর্ম সংযমও অপরিহার্য। কর্ম সংযম অর্থাৎ সৎকর্ম ও নৈতিক আচরণ পালন করা, একই সঙ্গে হত্যা, স্বার্থপর কার্যকলাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। চুরি, হিংসা, মিথ্যাবাক্য ও মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকাই হল সম্যক কর্মান্তের মূল শিক্ষা।

সম্যক আজীব- সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য নানা উপকরণের প্রয়োজন হয়, তবে সেই প্রয়োজন মেটাতে অসৎ পথ বেছে নেওয়া উচিত নয়। জীবনের জন্য যা দরকার তা সৎ ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে অর্জন করা কর্তব্য। প্রতারণা, কপটতা ও অন্যায় উপায় পরিহার করে সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করাই হল সম্যক আজীব। সম্যক ব্যায়াম- 'ব্যায়াম' শব্দের অর্থ পরিশ্রম বা সচেতন প্রচেষ্টা। শারীরিক ব্যায়ামে যেমন দেহ সুস্থ থাকে ঠিক তেমনি মানসিক ব্যায়ামেও মন সুস্থ থাকে। চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে মানসিক শুদ্ধতার চর্চা প্রয়োজন। যেমন অশুভ চিন্তা মন থেকে দূর করা, নতুন অসৎ ভাবনার উদয় রোধ করা, সৎ ও কুশল চিন্তার বিকাশ ঘটানো ইত্যাদি। সম্যক ব্যায়ামের মাধ্যমে অশুভ চিন্তা দূর করে নির্বাণার্থী নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্থ করে।

সম্যক স্মৃতি—সম্যক স্মৃতি হল সমস্ত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ও সজাগ থাকা। চারটি আর্যসত্য, ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়বস্তু, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার যথার্থ জ্ঞানের স্মৃতি যদি লোপ পায় তবে অর্জিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। তাই কেবল জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়, সেই জ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ও অবিদ্যার পুনরাবির্ভাব রোধ করতে প্রতিটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ সদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

সম্যক সমাধি-বুদ্ধদেবের প্রদত্ত দুঃখ নিরোধ মার্গের শেষ স্তর হল সম্যক সমাধি, যা ধ্যান নামেও পরিচিত। অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম সাতটি স্তর অতিক্রম করার পর নির্বাণার্থী ব্যাক্তি সকল অশুভ চিন্তা ও অনুভূতি থেকে

মুক্ত হয়ে শেষ স্তরে অর্থাৎ সম্যক সমাধিতে উপনীত হন। এই অবস্থাকে সপ্ত-সমাধি-পরিস্কার বলা হয়। সম্যক সমাধির মূলত চারটি স্তর এবং এই স্তরগুলির মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে চিত্তের শুদ্ধতা এবং নির্বাণলাভ সম্ভব হয়।

জৈন পঞ্চমহাব্রত:

জৈন দর্শনের যে নৈতিক আদর্শ উপস্থাপিত হয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়। জৈন নীতিতত্ত্বের এমন কিছু ভাবনা রয়েছে যা একদিকে যেমন অনন্য তেমনি বর্তমান সময়ের সঙ্গেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বৌদ্ধধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গ যেমন নৈতিক পরিশুদ্ধি এবং আত্মোন্নতির পথ নির্দেশ করে তেমনি জৈনধর্মে পঞ্চমহাব্রত নৈতিক আর্দশ প্রতিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধির মূলভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। জৈন ধর্মের মতে জীবের শুধু জ্ঞান বা কর্মের দ্বারা মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়না। বরং জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনটির সমন্বয়েই মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়। এই মোক্ষ লাভের জন্য সহায়ক পাঁচটি প্রধান কর্ম হল– অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এই পাঁচটি একত্রে 'পঞ্চব্রত' নামে পরিচিত[৯]। এই ব্রতগুলি গৃহীদের এবং শ্রমণদের পালনীয় ব্রত। গৃহীদের ক্ষেত্রে এগুলি অনুব্রত এবং শ্রমণদের ক্ষেত্রে এগুলি মহাব্রত। কারণ, গৃহীদের ক্ষেত্রে এই ব্রতগুলি শিথিল করা হয়েছে এবং শ্রমণদের ক্ষেত্রে কঠোর করা হয়েছে, তাই অনুব্রত এবং মহাব্রত বলা হয়।

অহিংসাব্রত–অহিংসাকে ভিত্তি করে জৈন নীতিতত্ত্বে যে পঞ্চব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায় তা বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অহিংসা বলতে বোঝায় সকল প্রকার হিংসা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা কোনো জীবের ক্ষতি না করায় অহিংসার মূলভাব। যদিও অহিংসা শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় তবুও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গভীর। এটি কেবল কারোর ক্ষতি বা আঘাত না করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা বরং সকল জীবের প্রতি ভালোবাসা ও মঙ্গল সাধনের মধ্যেই অহিংসা ব্রতের মূল অর্থ নিহিত।

সত্যব্রত–সত্যব্রতের অর্থ হল মিথ্যাভাষণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। জীবের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম যেন সর্বদা কল্যাণকর হয় এবং একই সঙ্গে হিতকর হয় সেই নীতিই সত্যব্রতের সারমর্মের মধ্যে নিহিত। শ্রমণদের জন্য সত্যব্রত কঠোর ভাবে পালনীয় হলেও গৃহস্থদের জন্য এই নিয়ম কিছুটা শিথিল। লক্ষণীয় যে, যে সত্যচর্চা অহিংসার পরিপন্থী, সেই সত্য পালন জৈনধর্মে স্বীকার্য নয়। কারণ জৈনধর্মে অহিংসা সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ। জৈনধর্ম অনুযায়ী সত্য বলার ফলে যদি কোনো জীবের প্রতি কষ্ট, আঘাত কিংবা ক্ষতি হয় তবে সেই সত্যও হিংসার অন্তর্গত বলে গণ্য হয়। তাই অহিংসার আদর্শ অক্ষুন্ন রাখতে সত্য বলার ক্ষেত্রেও সংযম পালন করা জরুরি।

অস্তেয়ব্রত— অস্তেয়ব্রত অহিংসাব্রতের পরিপূরক। অজ্ঞাতে কিংবা অনিচ্ছায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ না করায় হল অস্তেয়ব্রত। জীবের বেঁচে থাকার জন্য সম্পদের প্রয়োজনীয়তা একান্ত তবে তা অন্যের অনুমতি বা সম্মতি ব্যাতীত যদি গ্রহণ করা হয় তবে তাকে স্তেয় বা চোর্য বলা হয়। গৃহস্থদের জন্য এই ব্রতটি আংশিক ভাবে পালনীয় হলেও সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে এই ব্রত সম্পূর্ণ ভাবে পালনীয়। এই অস্তেয়ব্রতের চর্চা দৈনন্দিন জীবনে শুধু বস্তুগত চুরি থেকে বিরত থাকার শিক্ষা নয় বরং সত্যনিষ্ঠা, সততা এবং ন্যায়বোধের প্রতিফলন।

ব্রহ্মচর্য্যব্রত— ব্রহ্মচর্যের অর্থ এমন জীবনধারা বা আচরণ, যা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার উদ্দেশে গৃহীত হয়। সমস্ত ধরণের যৌনাচারে কায়িক, বাচিক ও মানসিক কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও সংযমই হল ব্রহ্মচর্যব্রত। সন্ন্যাসীদের জন্য এই ব্রত কঠোর ভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।

অপরিগ্রহব্রত— সমস্ত ভোগ্য-বস্তুর আসক্তি থেকে মুক্ত থাকাই অপরিগ্রহ। সঙ্ঘের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শ্রমণদের সম্পূর্ণ ত্যাগী হতে হয়। কেবল জাগতিক বিষয়ই নয়, নিজের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রতিও আসক্তি বিহীন হতে হয়। গৃহস্থদের জন্য অপরিগ্রহের পালন সীমিত ও সংযত ভাবে নির্ধারিত। অপরিগ্রহ আমাদের

এই শিক্ষাই দেয় যে, যা প্রয়োজন শুধু তাই গ্রহণ করা এবং অপ্রয়োজনীয় ভোগ থেকে বিরত থাকা। এই ভাবেই অপরিগ্রহ মানুষকে নৈতিক ও সুষম জীবনের পথে পরিচালিত করে।

ভারতীয় নীতিচিন্তার ইতিহাসে বৌদ্ধ ও জৈন নীতিদর্শন এক অনন্য সংলাপের জন্ম দিয়েছে— একদিকে করুণার তীব্র মানবতাবোধ, অন্যদিকে কঠোর আত্মসংযমের সুনিদিষ্ট আচার। আধুনিক সমাজ যখন ক্রমশ ভোগবাদিতা, প্রতিযোগিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন, তখন এই দু'টি নীতিবোধ যুগের গহ্বরে লুকিয়ে থাকা শাশ্বত সত্যকে আমাদের সামনে নতুন করে উন্মোচিত করে। প্রাচীন ভারতীয় নীতিদর্শনের সত্যগুলি কেবল অতীতের স্মারক নয়; সমকালীন নীতি-সঙ্কটের অন্ধকারে এরা পথপ্রদর্শক আলোকশিখা। উক্ত দুই নীতিদর্শনের সম্মিলিত চেতনা প্রমাণ করে— নীতি কখনও পুরনো হয় না; সত্য কখনও লুপ্ত হয় না। মানবতার সৎ-প্রচেষ্টা যতদিন বহমান থাকবে, ততদিন সনাতন নৈতিক আদর্শই প্রাচীন ও নবীন জীবনবোধের মধ্যে সামঞ্জস্যের সেতুবন্ধন রচনা করবে। সবশেষে বলা যায়, নদী যেমন তার রূপ বদলায়, কিন্তু স্রোত বদলায় না, তেমনি নৈতিকতার মূল চেতনাও যুগে যুগে রূপান্তরিত হয়ে নতুন প্রজন্মকে পথ দেখিয়ে চলে।

---

১ *দীঘনিকায়, মহাবগগ,* মহাসতিপট্ঠান সূত্রান্ত, 'দুঃখসূত্র', *সংযুক্তনিকায়* ২১/৩/১/২

২ মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। *ভারতীয় দর্শন।* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,২০১৫, পৃষ্ঠা, ৮২।

৩. *দীঘনিকায়,* মহাসতিপট্ঠান সূত্রান্ত।

৪. Bodhi, Bhikkhu. *The Noble Eightfold Path: Way to the End of Suffering.* Buddhist Publication Society,1994, p. 5.

৫. Buddhaghosa. *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, Translated by Bhikkhu Nanamoli, Buddhist Publication Society,2010, p. 599.

৬. Gethin, Rupert. *The Foundations of Buddhism.* Oxford University Press, 1998, p. 75.

৭. Bukkyo Dendo Kyokai. *The Teaching of Buddha*. 66th ed. Bukkyo Dendo Kyokai, 2005, p.163.

৮. Warder, A. K. *Indian Buddhism*. 3rd ed. Motilal Banarasidass,2000, p. 99.

৯. Bhargava, Dayanand. *Jaina Ethics*. Motilal Banarasidass, 1968.

গ্রন্থপঞ্জি:

বাংলা গ্রন্থ:

১. আচার্য মহাপ্রজ্ঞ। *অহিংসার এক অদৃশ্য দিক*। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক অনুব্রত সমিতি, ১৯৯৮।

২. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীকুমার। *সমন্বয় মার্গ*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭।

৩. চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী। *পালী ত্রিপিটক* (বাংলা ভাষায় পালি ত্রিপিটকের সার সঙ্কলন)। মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা ২০১১।

৪. চৌধুরী, সাধনকমল (সম্পাদিত ও ভাষান্তরিত)। *বিশুদ্ধ মজ্ঝিমনিকায়*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৫।

৫. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ। *বৌদ্ধধর্ম্ম*। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ ১৯০১।

৬. ভট্টাচার্য, অমিত। *বৌদ্ধ দর্শনম্* । সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা ২০০৭।

৭. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। *ভারতীয় দর্শন*। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮।

৮. মহাস্থবির, রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন (সঙ্কলিত ও অনূদিত)। *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ ১৯৪১।

৯. মুনিজী, শ্রীসুজষ। *জৈনধর্ম ও শাসনাবলী*। শ্রী অখিলভারতীয় স্বারক জৈনসংগঠন, ১ম সংস্করণ, ৬ই মে ২০০০।

১০. শাস্ত্রী, পঞ্চানন (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ-দর্শনম্*। গুপ্তপ্রেস, কলকাতা, ১৪০১।

১১. শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ। *ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম*। জৈনভবন, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৩৮১।

ইংরেজি গ্রন্থ:

১২. Bodhi, Bhikkhu. *The Noble Eightfold Path: Way to the End of Suffering.* Kandy: Buddhist Publication Society,1994.

১৩. Buddhaghosa. *The Path of Purification (Visuddhimagga).* Translated by Bhikkhu *Ñāṇamoli*. Kandy: Buddhist Publication Society, 2010

১৪. Gethin, Rupert. *The Foundation of Buddhism*. Oxford: Oxford University Press, 1998.

১৫. *Ñāṇamoli*, Bhikkhu, trans. *The Path of Discrimination (Patisambhidāmagga).* London: Pali Text Society, 1982.

১৬. Warder, A. K. *Indian Buddhism*. Motilal Banarasidass Publishers, 1970.